أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 111) www.motaher21.net

أَفَلَا تَعْقِلُونَ

"তবে কি তোমরা বুঝো না?"

" Have you then no sense?"

সুরাঃ আল- বাকারাহ

৪৪ নং আয়াতের

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দিবে এবং নিজেদের কথা ভুলে যাবে। অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করো, তবে কি তোমরা বুঝো না?

৪৪ নং আয়াতের তাফসীর:

অন্যকে উপদেশ দিয়ে নিজে তা না করার জন্য তিরস্কার

আল্লাহ তা ‘আলা লোকদেরকে আচরণের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, যারা ভালো কাজের আদেশ করেন তাদের উচিত প্রথমেই নিজেরা তা বাস্তবায়ন করে উদাহরণ সৃষ্টি করা। (তাফসীর তাবারী ২/৮) মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক (রহঃ) ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এর ভাবার্থ হলো ‘অথচ তোমরা নিজেরা তা কার্যকর করতে ভুলে যাও।’ কিতাবীদেরকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে, যারা অন্যকে ভালো কাজের আদেশ করে থাকে, অথচ নিজেরা তা পালন করে না। তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে, এটা জানা সত্ত্বেও যে কিতাবীরা এ কাজ করছে এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে। তাই তাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা অপরকে যেমন আল্লাহভীতি ও পবিত্রতার কথা শিক্ষা দিচ্ছে, তাদের নিজেদেরও তার ওপর ‘আমল করা উচিত। অপরকে সালাত-সিয়ামের নির্দেশ দেয়া, অথচ নিজে পালন না করা বড়ই লজ্জার কথা। জনগণকে বলার পূর্বে মানুষের উচিত নিজে ‘আমলকারী হওয়া। অর্থ এও হচ্ছে যে, তারা অন্যদেরকে তো তাদের কিতাবকে অস্বীকার করতে নিষেধ করছে অথচ মহান আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অস্বীকার করে নিজেরাই তাদের কিতাবকে অস্বীকার করছে। ভাবার্থ এও হতে পারে যে, তারা অন্যদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলছে, অথচ ইহলৌকিক ভয়ের কারণে তারা নিজেরাই ইসলাম কবূল করছে না।

একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য

এখানে এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, ভালো কাজের নির্দেশ দেয়ার জন্য আহলে কিতাবদেরকে তিরস্কার করা হয়নি, বরং তারা নিজেরা পালন না করার জন্য তিরস্কৃত হয়েছে। ভালো কথা বলা তো ভালোই, বরং এটা তো ওয়াজিব, কিন্তু সাথে সাথে মানুষের নিজেরও তার প্রতি ‘আমল করা উচিত। যেমন শু ‘আইব (আঃ) বলেছেনঃ

﴿وَ مَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ؕ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ؕ وَ مَا تَوْفِيْقِيْۤ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْهِ اُنِيْبُ﴾

আর আমি এটা চাই না যে, আমি তোমাদের বিপরীত সেই সব কাজ করি যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করছি; আমি তো সংশোধন করে দিতে চাচ্ছি, যে পর্যন্ত আমার সাধ্যে হয়, আর আমার যা কিছু প্রচেষ্টা তা শুধু মহান আল্লাহরই সাহায্যে হয়ে থাকে; আমি তাঁরই ওপর ভরসা রাখি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি। (১১ নং সূরাহ্ হুদ, আয়াত নং ৮৮) সুতরাং ভালো কাজ করতে বলা ওয়াজিব এবং নিজে করাও ওয়াজিব। একটি না করলে অন্যটিও ব্যর্থ হয়ে যাবে তা নয়। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ‘আলিমদের অভিমত এটাই। যদিও কতকগুলো লোকের অভিমত এই যে, যারা নিজেরা খারাপ কাজ করে তারা যেন অপরকে ভালো কাজের কথা না বলে। কিন্তু এটা সঠিক কথা নয়।

‘আমলহীন উপদেশদাতার শাস্তি

মুসনাদ আহমাদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মি ‘রাজের রাতে আমি দেখেছি যে, কতকগুলো লোকের ওষ্ঠ আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, এরা কারা? তখন আমাকে বলা হলো যে, এরা আপনার উম্মাতের বক্তা, উপদেশ দাতা ও ‘আলিম। এরা মানুষকে ভালো কথা শিক্ষা দিতো কিন্তু নিজে ‘আমল করতো না, জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বুঝতো না।’ অন্য হাদীসে আছে যে, তাদের জিহ্বা ও ওষ্ঠ উভয়ই কাটা হচ্ছিলো। হাদীসটি বিশুদ্ধ। ইবনু হিব্বান (রহঃ), আদী ইবনু আবী হাতিম (রহঃ), ইবনু মিরদুওয়াই (রহঃ) প্রমুখ মনীষীদের লিখিত কিতাবের মধ্যে এটা বিদ্যমান আছে।

আবূ ওয়ায়িল (রহঃ) বলেন যে, একবার উসামা (রাঃ)-কে বলা হয়ঃ ‘আপনি ‘উসমান (রাঃ)-কে কেন কিছু বললেন না?’ তিনি উত্তরে বললেনঃ ‘আপনাদেরকে শুনিয়ে বললেই কি শুধু বলা হবে? আমি তো গোপনে তাঁকে সব সময়েই বলে আসছি। কিন্তু আমি কোন কথা ছড়াতে চাই না। মহান আল্লাহর শফথ! আমি কোন লোককে সর্বোত্তম বলবো না, যদিও সে আমার খুব নিকটেরও হয়। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ

কিয়ামতের দিন একটি লোককে আনা হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তার নাড়িভূঁড়ি বেরিয়ে আসবে এবং সে তার চারদিকে ঘুরতে থাকবে। অন্যান্য জাহান্নামবাসীরা তাকে জিজ্ঞেস করবেঃ ‘জনাব আপনি তো আমাদেরকে ভালো কাজের আদেশ করতেন এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতেন, আপনার এ অবস্থা কেন?’ সে বলবেঃ ‘আফসোস! আমি তোমাদেরকে বলতাম, কিন্তু নিজে ‘আমল করতামনা। আমি তোমাদেরকে বিরত রাখতাম কিন্তু নিজে বিরত থাকতামনা। (ফাতহুল বারী ৬/৩৮১, সহীহ মুসলিম ৪/২২৯১, মুসনাদ আহমাদ ৫/২০৫)

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘এক স্থানে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা ‘আলা বলেনঃ তোমরা জনগণকে ভালো কাজের আদেশ করছো, আর নিজেদের সম্বন্ধে বেখবর রয়েছো। ইবরাহীম নাখ ‘ঈ (রহঃ) বলেনঃ তিনটি সূরার আয়াতের কারণে আমি লোকদেরকে উপদেশ দেয়ার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ি। তা হলো আলোচ্য এ আয়াতটি এবং নিম্নের দু’টি আয়াতসমূহ। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ﴾

হে মু’মিনগণ! তোমরা যা করো না তা তোমরা কেন বলো? তোমরা যা করো না তোমাদের তা বলা মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক। (৬১ নং সূরাহ্ সাফ, আয়াত নং ২-৩। তাফসীর কুরতুবী ১/৩৬৭) মহান আল্লাহর নিকট এটা খুব অসন্তুষ্টির কারণ যে, তোমরা যা বলবে তা নিজেরা করবে না।’ অন্য আয়াতে শু’আইব (আঃ)-এর কথা, যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَ مَاۤ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَاۤ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ؕ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ؕ وَ مَا تَوْفِيْقِيْۤ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْهِ اُنِيْبُ﴾

আর আমি এটা চাইনা যে, আমি তোমাদের বিপরীত সেই সব কাজ করি যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করছি; আমি তো সংশোধন করে দিতে চাচ্ছি, যে পর্যন্ত আমার সাধ্যে হয়, আর আমার যা কিছু প্রচেষ্টা তা শুধু মহান আল্লাহরই সাহায্যে হয়ে থাকে; আমি তাঁরই ওপর ভরসা রাখি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি। (১১ নং সূরাহ্ হুদ, আয়াত নং ৮৮)

আচ্ছা বলতো ! তুমি কি এই তিনটি আয়াত হতে নির্ভয় হয়ে রয়েছো? সে বলেঃ ‘না।’ তিনি বলেনঃ ‘তুমি স্বীয় নাফ্স হতেই আরম্ভ করো।’

অতঃপর আল্লাহ তা ‘আলা আহলে কিতাবদের একটি ঘৃণিত আচরণের কথা তিরস্কারের সাথে বলেন: তোমরা নিজেরা মানুষদেরকে সৎ (ঈমান ও কল্যাণকর) কাজ করার নির্দেশ দাও অথচ নিজেদের ক্ষেত্রে তা ছেড়ে দাও, তোমরা কি তা বুঝ না? এখানে মানুষের বোধশক্তিকে ‘আকল’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে তার আকল বা বিবেক প্রথমেই তাকে ভাল কাজ করার প্রতি উৎসাহিত করে এবং খারাপ কাজের প্রতি নিরুৎসাহিত করে।

অতএব যে ব্যক্তি অপরকে ভাল কাজের নির্দেশ দেয় কিন্তু নিজে করে না অথবা অপরকে খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করে কিন্তু সে বিরত থাকে না সে ব্যক্তি বিবেকবান নয়।

আয়াতটি যদিও বানী ইসরাঈলের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে কিন্তু তার বিধান সকলের জন্য প্রযোজ্য। (তাফসীরের সা ‘দী, পৃ. ২৯)

যারা মানুষদেরকে ভাল কাজের নির্দেশ দেয় কিন্তু নিজেরা জেনেশুনে তার বিপরীত করে তাদের ব্যাপারে কুরআন ও সহীহ হাদীসে তিরস্কার ও শাস্তির কথা এসেছে। যেমন আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ)

“হে মু’মিনগণ! তোমরা যা কর না তা তোমরা কেন বল? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক।” (সূরা সফ ৬১:২)

আনাস বিন মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: মি ‘রাজের রাতে আমি দেখেছি যে, কতকগুলো লোকের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে। [রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? বল হল, এরা আপনার উম্মাতের বক্তা যারা মানুষদেরকে সৎ কাজের আদেশ করত এবং নিজেরা করত না। তারা কিতাব পাঠ করত, কিন্তু তারা বুঝত না। (মুসনাদ আহমাদ হা: ১২৮৭৯ হাসান)

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, কিয়ামাতের দিন একটি লোককে আনা হবে। যার নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে আসবে এবং তার চারদিকে ঘুরতে থাকবে। অন্যান্য জাহান্নামীরা তাকে বলবে, জনাব আপনিতো আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করতেন এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতেন, আপনার এ অবস্থা কেন? সে বলবে, আফসোস! আমি তোমাদেরকে ভাল কথা বলতাম কিন্তু নিজে আমল করতাম না। আমি তোমাদেরকে খারাপ হতে বিরত রাখতাম কিন্তু নিজে বিরত থাকতাম না। (সহীহ বুখারী হা: ৩২৬৭, সহীহ মুসলিম হা: ২২৯০, ২২৯১)

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. অন্যকে ভাল কাজের দিকনির্দেশনা দিয়ে নিজে তা না করা একটি ভয়াবহ অপরাধ।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-৪৫

وَ اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ وَ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَۙ

সবর ও নামায সহকারে সাহায্য নাও। নিঃসন্দেহে নামায বড়ই কঠিন কাজ, কিন্তু সেসব অনুগত বান্দাদের জন্য কঠিন নয়।

৪৫ নং আয়াতের তাফসীর:

আল্লাহ তা ‘আলা মানব জাতিকে সালাত ও ধৈর্যের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কাজে সাহায্য প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার ফলাফল কী সে সম্পর্কে আল্লাহ তা ‘আলা অন্যত্র বলেন:

(إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ)

“নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।” (সূরা আনকাবুত ২৯:৪৫)

আল্লাহ তা ‘আলা আরো বলেন:

(وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰي)

“এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও ও তাতে অবিচলিত থাকো, আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাই না; আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দেই এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।” (সূরা ত্বা-হা- ২০:১৩২)

তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন বিপদের সম্মুখীন হলে দ্রুত সালাতে মগ্ন হতেন।

এ সালাত তাদের জন্য সহজ-সাধ্য কাজ যারা আল্লাহ তা ‘আলাকে ভয় করে এবং পরকালে আল্লাহ তা ‘আলার সাথে সাক্ষাতের প্রত্যাশী। আর যারা আল্লাহ তা ‘আলাকে ভয় করে না সালাত তাদের জন্য সহজ নয়।

অর্থাৎ যদি সৎকর্মশীলতার পথে চলা তোমরা কঠিন মনে করে থাকো তাহলে সবর ও নামায এই কাঠিন্য দূর করতে পারে। এদের সাহায্যে শক্তি সঞ্চয় করলে এ কঠিন পথ পাড়ি দেয়া তোমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে।সবর শব্দটির শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, বাধা দেয়া, বিরত রাখা ও বেঁধে রাখা। এক্ষেত্রে মজবুত ইচ্ছা, অবিচল সংকল্প ও প্রবৃত্তির আশা –আকাংখাকে এমনভাবে শৃংখলাবদ্ধ করা বুঝায়, যার ফলে এক ব্যক্তি প্রবৃত্তির তাড়না ও বাইরের সমস্যাবলীর মোকাবিলায় নিজের হৃদয় ও বিবেকের পছন্দনীয় পথে অনবরত এগিয়ে যেতে থাকে। এখানে আল্লাহর এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই নৈতিক গুণটিকে নিজের মধ্যে লালন করা এবং বাইর থেকে একে শক্তিশালী করার জন্য নিয়মিত নামায পড়া।

ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সাহায্য লাভ হবে

এ আয়াতে মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের কাজে ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে।

মহান আল্লাহর বান্দাদেরকে কর্তব্য পালন করতে এবং সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। সিয়াম পালন করাও হচ্ছে ধৈর্য ধারণ করা। এ জন্যই রামাযান মাসকে ধৈর্যের মাস বলা হয়েছে। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ১/১৫৪) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ‘সিয়াম অর্ধেক ধৈর্য।’ ধৈর্যের ভাবার্থ পাপের কাজ হতে বিরত থাকাও বটে। এ আয়াতে যদি ধৈর্যের ভাবার্থ এটাই হয়ে থাকে তাহলে মন্দ কাজ হতে বিরত থাকা ও সাওয়াবের কাজ করা এ দু’ টিই বর্ণনা হয়ে গেছে। সাওয়াবের কার্যসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে সালাত। ‘উমার (রাঃ) বলেনঃ ‘ধৈর্য দু’ প্রকার। (১) বিপদের সময় ধৈর্য। (২) পাপের কাজ হতে বিরত থাকার ধৈর্য। দ্বিতীয় ধৈর্য প্রথম ধৈর্য হতে উত্তম।’ সা ‘ঈদ ইবনু যুবাইর (রহঃ) বলেনঃ ‘প্রত্যেক জিনিস মহান আল্লাহর পক্ষ হতে হয়ে থাকে মানুষের এটা স্বীকার করা, সাওয়াব প্রার্থনা করা এবং বিপদের প্রতিদানের ভাণ্ডার মহান আল্লাহর নিকট আছে এটা মনে করার নাম ধৈর্য।’ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে ধৈর্যধারণ করলেও মহান আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করা হয়। সাওয়াবের কাজে সালাত দ্বারা বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়। কুর’ আন মাজীদে ঘোষিত হয়েছেঃ

﴿اُتْلُ مَاۤ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ﴾

তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব আবৃত্তি করো এবং সালাত প্রতিষ্ঠিত করো। নিশ্চয়ই সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে। মহান আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। (২৯ নং সূরাহ্ ‘আনকাবূত, আয়াত নং ৪৫) হুযাইফা (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখনই কোন কঠিন ও চিন্তাযুক্ত কাজের সম্মুখীন হতেন তখনই তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। সম্ভবত এখানে সর্বনাম প্রয়োগ করা হয়েছে উপদেশ দানের উদ্দেশে, ধৈর্য এবং সালাতের মাধ্যমে, যেমনটি উল্লেখ পাওয়া যায় একই আয়াতে। অনুরূপ, কুরুন সম্পর্কে আল্লাহ তা ‘আলা বলেনঃ

﴿وَ قَالَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَیْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَیْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ۚ وَ لَا یُلَقّٰىهَاۤ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ﴾

আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিলো তারা বললোঃ ধিক্ তোমাদেরকে! যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্য মহান আল্লাহর পুরস্কার শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত এটা কেউ পাবে না। (২৮ নং সূরাহ্ কাসাস, আয়াত নং ৮০) আল্লাহ তা ‘আলা আরো বলেনঃ

﴿وَ لَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّیِّئَةُ ؕ اِدْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِیْ بَیْنَكَ وَ بَیْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِیٌّ حَمِیْمٌ ﴿۳۴﴾ وَ مَا یُلَقّٰىهَاۤ اِلَّا الَّذِیْنَ صَبَرُوْا ۚ وَ مَا یُلَقّٰىهَاۤ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِیْمٍ﴾

ভালো কাজ এবং মন্দ কাজ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত করো উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা মহাভাগ্যবান। (৪১ নং সূরাহ্ হা-মিম সাজদাহ, আয়াত নং ৩৪-৩৫)

খন্দকের যুদ্ধে রাতের বেলায় হুযাইফা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে হাযির হলে তাঁকে সালাত আদায় করতে দেখতে পান। অন্যত্র ‘আলী (রাঃ) বলেনঃ ‘বদর যুদ্ধের রাতে আমরা সবাই শুইয়ে পড়েছি, আর জেগে দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সারা রাত সালাত আদায়ে রত রয়েছেন। সকাল পর্যন্ত তিনি সালাত ও প্রার্থনায় মশগুল ছিলেন।’

وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ আর তাঁরই দিকে প্রতিগমন করবে। অর্থাৎ তাদের বিষয় সম্পূর্ণই মহান আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল, তিনি তাঁর বান্দার ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। যেহেতু তারা জানেন যে, তাদেরকে অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে এবং তাদেরকে চেনা যাবে সেহেতু মহান আল্লাহর নির্ধারিত ‘আমলসমূহ পালন করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা সহজ।

‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) সফরে তাঁর ভাই কাসাম (রাঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ﴿اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَیْهِ رٰجِعُوْنَ﴾) (২ নং সূরাহ্ বাকারাহ, আয়াত নং ১৫৬)পাঠ করে পথের এক ধারে সরে গিয়ে উটকে বসিয়ে দেন এবং সালাত শুরু করেন। দীর্ঘক্ষণ সালাত আদায় করার পর সাওয়ারীর নিকট আসেন এবং এই আয়াত দু’ টি পাঠ করতে থাকেন। মোট কথা, ধৈর্য ও সালাত এ দু’ টি দ্বারা মহান আল্লাহর করুণা লাভ করা যায়। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَ رَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا﴾

পাপীরা আগুন অবলোকন করে আশঙ্কা করবে যেন তারা এতেই পতিত হবে, বস্তুত এটা হতে তারা পরিত্রাণ পাবে না। (১৮ নং সূরাহ্ কাহফ, আয়াত নং ৫৩)

একটি সহীহ হাদীসে আছে যে, কিয়ামতের দিন এক পাপীকে আল্লাহ তা ‘আলা বলবেনঃ ‘আমি কি তোমাকে স্ত্রী ও সন্তানাদি দেইনি? তোমার প্রতি কি নানা প্রকারের অনুগ্রহ করিনি, ঘোড়া ও উটকে কি তোমার অধীনস্থ করিনি? তোমাকে কি শান্তি, আরাম, আহার্য ও পানীয় দেইনি?’ সে বলবে, ‘হ্যাঁ, হে প্রভু! এ সব কিছুইু ছিলো।’ তখন মহান আল্লাহ বলবেনঃ ‘তাহলে তোমার কি এই জ্ঞান ও বিশ্বাস ছিলো না যে, তোমাকে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে? সে বলবেঃ ‘হ্যাঁ হে প্রভু! এর প্রতি আমার বিশ্বাস ছিলো।’ মহান আল্লাহ বলবেনঃ ‘তুমি যেমন আমাকে ভুলে গিয়েছিলে তেমনই আমিও তোমাকে ভুলে গেলাম।’ (সহীহ মুসলিম ৪/২২৭৯)

মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ ‘সবর’ এর তাফসীর করেছেন ‘সাওম’ । [আত-তাফসীরুস সহীহ] আল্লামা শানকীতী বলেন, ধৈর্য্যের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা সুস্পষ্ট বিষয়। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে এক সময় তার উপর আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হবে এবং সে সফলকাম হবে। কিন্তু সালাতের মাধ্যমে কিভাবে সাহায্য প্রার্থনা করবে? এর উত্তর হচ্ছে, সালাতের মাধ্যমে অন্যায় অশ্লীল কাজ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। আল্লাহ্ বলেন, “নিশ্চয় সালাত অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে দূরে রাখে। " [সূরা আল-আনকাবুত: ৪৫]

এটা নিশ্চয় এক বিরাট সাহায্য। তাছাড়া সালাতের মাধ্যমে রিযকের মধ্যে প্রশস্তি আসে। আল্লাহ্ বলেন, “আর আপনার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দিন ও তাতে অবিচল থাকুন, আমরা আপনার কাছে কোন জীবনোপকরণ চাই না; আমরাই আপনাকে জীবনোপকরণ দেই এবং শুভ পরিণাম তো তাকওয়াতেই নিহিত " [সূরা ত্বা-হা: ১৩২]

আর এ জন্যই “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন বিষয়ে সমস্যায় পড়তেন বা চিন্তাগ্রস্ত হতেন তখনই তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে যেতেন” । [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩৮৮]

সুতরাং যে কোন বিপদাপদে ও সমস্যায় সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কটা তাজা করে নেয়ার মাধ্যমে সাহায্য লাভ করা যেতে পারে। সালফে সালেহীন তথা সাহাবা, তাবেয়ীন ও সত্যনিষ্ঠ ইমামগণ থেকে এ ব্যাপারে বহু ঘটনা বর্ণিত আছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার নিকট তার ভাই 'কুছাম' এর মৃত্যুর খবর পৌছল, তিনি তখন সফর অবস্থায় ছিলেন। তিনি তার বাহন থেকে নেমে দুরাকাআত সালাত আদায় করেন এবং এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। তাবারী অনুরূপভাবে আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ অবস্থায় পড়লে একবার এমনভাবে বেহুশ হয়ে যান যে সবাই ধারণা করে বসেছিল যে, তিনি বুঝি মারাই গেছেন। তখন তার স্ত্রী উম্মে কুলসুম মসজিদে গিয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/২৬৯]

কুরআন ও সুন্নায় যেখানে (خُشُوْعٌ) বা বিনয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদানের বর্ণনা রয়েছে, সেখানে এর অর্থ অক্ষমতা ও অপারগতাজনিত সেই মানসিক অবস্থাকেই বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার সামনে নিজের ক্ষুদ্রতা ও দীনতার অনুভূতি থেকে সৃষ্টি হয়। এর ফলে ইবাদাত সহজতর হয়ে যায়। কখনো এর লক্ষণাদি দেহেও প্রকাশ পেতে থাকে। তখন সে শিষ্টাচারসম্পন্ন বিনম্র ও কোমল মন বলে পরিদৃষ্ট হয়। যদি হৃদয়ে আল্লাহ্‌ভীতি ও নম্রতা না থাকে, মানুষ বাহ্যিকভাবে যতই শিষ্টাচারের অধিকারী ও বিনম্র হোক না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সে বিনয়ের অধিকারী হয় না। বিনয়ের লক্ষণাদি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ করাও বাঞ্ছনীয় নয়। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার এক যুবককে নতশিরে বসে থাকতে দেখে বললেন, মাথা উঠাও, বিনয় হৃদয়ে অবস্থান করে। ইবরাহীম নখয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘মোটা কাপড় পরা, মোটা খাওয়া এবং মাথা নত করে থাকাই বিনয় নয় (خُشُوْعٌ) বা বিনয় অর্থ ‘অধিকারের ক্ষেত্রে ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সবার সংগে একই রকম ব্যবহার করা এবং আল্লাহ্ তাআলা যা ফরয করে দিয়েছেন তা পালন করতে গিয়ে হৃদয়কে শুধু তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট ও কেন্দ্রিভূত করে নেয়া। সারকথা, ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম উপায়ে বিনয়ীদের রূপ ধারণ করা শয়তান ও প্রবৃত্তির প্রতারণা মাত্র। আর তা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। অবশ্য যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে তা ক্ষমার্হ।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-৪৬

الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ۝

যারা মনে করে, সবশেষে তাদের মিলতে হবে তাদের রবের সাথে এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।

৪৬ নং আয়াতের তাফসীর:

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুগত নয় এবং আখেরাতে বিশ্বাস করে না, তার জন্য নিয়মিত নামায পড়া একটি আপদের শামিল। এ ধরনের আপদে সে কখনো নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সোপর্দ করেছে এবং যে ব্যক্তি মৃত্যুর পর তার মহান প্রভুর সামনে হাযির হবার কথা চিন্তা করে, তার জন্য নামায পড়া নয়, নামায ত্যাগ করাই কঠিন।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. বিপদাপদে ও কঠিন মুহূর্তে সালাত ও ধৈর্যের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত।

২. ঈমান ও সৎ আমলের মাধ্যমে জাহান্নামের শাস্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করা ওয়াজিব।